শিক্ষাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধারণাসমূহ

নতুন দিনের শিক্ষা

জয়দীপ দে

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

নতুন দিনের শিক্ষা
জয়দীপ দে

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
Tjitske Kamphuis-এর চিত্রকর্ম অবলম্বনে
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/4 আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ৪০০ টাকা

Natun Diner Shiksha by Joydip Dey Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: August 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 400 Taka RS: 400 US 20 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN 978-984-2250-24-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

মোহাম্মদ আজিজুল হক

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

বর্তমান যুগকে বলা হয় এডুকেশন ৪.০-এর যুগ। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মানুষের পেশা, যোগাযোগ এবং জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাতেও নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হয়েছে। এতে আধুনিক প্রযুক্তি, সৃজনশীল চিন্তা, সমস্যা সমাধান ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক শেখাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের এমন দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা যাতে তারা দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে সফলভাবে কাজ করতে পারে।

এডুকেশন ৪.০-এর বৈশিষ্ট্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিকতা, দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা, বাস্তবমুখী শিক্ষা। এডুকেশন ৪.০-এ শিক্ষক কেবল তথ্য প্রদানকারী নন; বরং তিনি একজন সহায়ক ও পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেন। এখন আমাদের এডুকেশন ৪.০ সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার সময়।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছি। নিয়মিত পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। এসব ধারণা মাঠে প্রয়োগ করতে গিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হই। এসব ধারণা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে একসময় সামাজিক মাধ্যম ও পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতাম। এসব লেখা লিখতে গিয়েই মূলত এই বই করার পরিকল্পনা মাথায় আসে। আশা করি এই বইয়ের মাধ্যমে সম্মানিত সহকর্মীগণ হাল আমলে শিক্ষাজগতে বহুল আলোচিত কিছু প্রসঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হবেন। তাদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক হবে।

এই বইটি পড়তে গিয়ে অনেকের কাছে বিষয় বিন্যাসে পরম্পরাহীনতা অনুভূত হতে পারে। কখনো শিক্ষা দর্শন, কখনো শিখন পদ্ধতি, কখনো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আসলে এই বইটি আমার নোট খাতার মুদ্রিত রূপ। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে হয়েছে, তা একেক সময় একেকটি নিবন্ধ আকারে লিখেছি। এই নিবন্ধগুলো আপনাদের জন্য চিন্তাবিন্দু হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এসব মিলিয়ে নিলে নতুন দিনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।

প্রায় প্রতিটি লেখায় তথ্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। তাই আলাদা করে তথ্যসূত্র দেওয়া হয়নি। বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন প্রফেসর গৌতম রায়, সমীর কান্তি রায় ও বিপ্লব নন্দী। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রার্থনীয়।

জয়দীপ দে

সূচিপত্র

বুদ্ধির হিসেব নিকেশ	৯
হরেক রকম বুদ্ধি	১১
আবেগ যখন বুদ্ধির অংশ	১৩
শিশুর আবেগীয় সংযোগ	১৬
বুদ্ধির স্তর	২০
মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশ	২২
মানুষের নৈতিক বিকাশ	২৫
সৃজনশীল উপায়ে সমস্যার সমাধান	২৭
শিশু যেভাবে পরিপক্ব হয়	২৯
শিশুর সুষম উন্নয়ন	৩২
মানুষের মনোসামাজিক বিকাশ	৩৪
মন বুঝে পড়া	৩৭
জার্মানির কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা	৩৯
ইতালির মন্টেসরি শিক্ষা পদ্ধতি	৪২
রাশিয়ার সামাজিক গঠনবাদ	৪৫
শিক্ষাতত্ত্বের বিভিন্ন ধারা	৪৭
চিন্তার রকমফের	৪৯
উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা	৫০
ব্লুম থেকে বিভিন্ন ধারা	৫৩
শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের তিন গুরু	৫৬
অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শেখা	৫৯
জন ডিউইর শিক্ষাদর্শন	৬১
করে শেখা	৬২
ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট	৬৫
শরীরের ভাষা	৬৮
সাফল্যের খোঁজে	৭০
সাফল্য ব্যর্থতার কারণ	৭৩
বদলে যাচ্ছে পেশা	৭৫
পেডাগজি ৩.০	৭৭
ক্লাসকে সক্রিয় করে তোলার উপায়	৭৮
নিজে নিজে শেখা	৮০
শেখানো নয়, শেখা	৮৩
শেখার শর্ত	৮৫
মস্তিষ্ককে ছাড়িয়ে সংযুক্তি	৮৬
আবিষ্কারভিত্তিক শিক্ষা	৮৭
শ্রেণিকক্ষে শিখন সংস্কৃতি	৮৮
পড়ায় আমার মন বসে না	৯০

শিক্ষার্থীর শিখন বোঝার চেষ্টা	৯২
চিন্তা নিয়ে চিন্তা	৯৪
শ্রেণিকক্ষে সহানুভূতির চর্চা	৯৫
ফিনল্যান্ডের পরিস্থিতিভিত্তিক শিক্ষণ	৯৭
শ্রেণিকক্ষে প্রেষণা	৯৯
শিক্ষার্থীর মুখের অভিব্যক্তি	১০০
প্রশ্নের মাধ্যমে ক্রিটিক্যাল থিংকিং চর্চা	১০২
চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজে শেখা	১০৫
নতুন দিনের শিখন পদ্ধতি	১০৭
খেলতে খেলতে শেখা	১০৯
প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা	১১১
উল্টে দেওয়া শ্রেণিকক্ষ	১১৩
শিক্ষাক্রম নিয়ে নানা ভাবনা	১১৫
সারা বিশ্বে জনপ্রিয় কিছু শিক্ষাক্রম	১১৭
শিক্ষাক্রমের জনপ্রিয় দুই ধারা	১২০
ফিনল্যান্ডের শিক্ষা সেরা কেন?	১২২
জাপানের লেখাপড়া	১২৫
ভারতের নতুন শিক্ষাক্রম	১২৭
মুক্ত শিক্ষাসামগ্রী	১৩০
বৈশ্বিক নাগরিকত্ব শিক্ষা	১৩২
রূপান্তরমূলক শিক্ষাবিজ্ঞান	১৩৩
একুশ শতকের শিক্ষকের দক্ষতা	১৩৬
একুশ শতকের শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য	১৩৮
শিক্ষকদের জন্য এআই স্কিল	১৪০
পড়াতে পড়াতে পরীক্ষা	১৪২
ক্লাসরুম যেমন হওয়া চাই	১৪৭
শ্রেণিকক্ষে আসনবিন্যাস	১৪৯
পড়া মনে রাখার কৌশল	১৫১
পাঠপরিকল্পনা কেমন হবে?	১৫৫
বিদ্যালয়ে শেখানো উচিত এমন ১২টি বিষয়	১৫৭
জীবনব্যাপী শিক্ষা	১৫৯
ভারতের শিক্ষা, ব্রিটেনের বিপ্লব	১৬১
টেকসই শিক্ষা	১৬২
যথাযথ মূল্যায়ন	১৬৪
বড়দের শেখানো	১৬৭
সামাজিক শিক্ষা	১৬৮
ভ্রমণ ও শিক্ষা	১৬৯
গ্লোবাল স্কুল নেটওয়ার্ক	১৭১
মানুষ যেভাবে ভাষা শেখে	১৭৩
পেডাগজি থেকে হিউটাগজি	১৭৪
শিক্ষায় পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি	১৭৬

বুদ্ধির হিসেব নিকেশ

‘তোর মাথায় গোবর, তোকে দিয়ে কিসসু হবে না’ কিংবা ‘চুপ থাক—তুই একটু বেশি বুঝছিস’। কথাগুলো আমাদের কাছে খুব পরিচিত। শৈশবে স্কুলের স্যারদের মুখে এরকম কথা অনেকেরই শোনা। তখন মনে মনে হয়তো নিজের পক্বত্ব বা অসাড়তা নিয়ে ব্যথিত হয়েছি আমরা। বড় হয়ে শিক্ষক হয়ে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কেন আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকরা এ রকম অনুচিত মন্তব্যগুলো করতেন। আসলে সমস্যাটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণে এক শিক্ষার্থীকে একটা বিষয় বোঝাতে একজন শিক্ষকের যে সময় লাগে অন্যকে বোঝাতে তার চেয়ে কম বা বেশি সময় লাগে। শিক্ষক যখন দেখেন গড়পড়তা সময়ের চেয়ে একজন শিক্ষার্থী বেশি সময় নিচ্ছে, বা কেউ তার আগে বুঝে নিয়ে অগ্রসর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করছে, তখনই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কথায় সে বিরক্তি তিনি প্রকাশ করেন। অথচ তিনি যদি জানতেন কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়, তাহলে সব ধরনের বুদ্ধির শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রেখে সুন্দর ক্লাস নিতে পারতেন।

সবার আগে জেনে নেই, বুদ্ধি কী? বুদ্ধি হলো মানুষের এমন সাধারণ মানসিক শক্তি যা দিয়ে সে জীবনের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। আর নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ক্ষমতাকে দক্ষতা বলা হয়। বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য বুদ্ধ্যাংক/বুদ্ধিমত্তার মান (IQ—Intelligence Quotient) ব্যবহার করা হয়, যার গড় মান ১০০।

IQ বা বুদ্ধিমত্তার মান ধারণাটি প্রবর্তন করেন অ্যালফ্রেড বিনে (Alfred Binet) এবং তাঁর সহকর্মী থিওডোর সিমোঁ (Theodore Simon)। তারা ১৯০৫ সালে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা পরিমাপের জন্য **বিনে-সিমোঁ টেস্ট** (Binet-Simon Test) তৈরি করেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির শেখার ক্ষমতা, যুক্তিবোধ এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে এই ধারণা আধুনিক IQ পরীক্ষার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণত বুদ্ধিমত্তার মান ৯০-১১০-এর মধ্যে থাকা মানুষকে মধ্যম বুদ্ধির ধরা হয়, যা প্রায় ৬০% মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাকি ৪০% মানুষের মধ্যে কেউ উন্নত, কেউ নিম্নবুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত—এ থেকেই শ্রেণিকক্ষে বৌদ্ধিক বৈচিত্র্য তৈরি হয়।

উন্নতবুদ্ধির শিক্ষার্থীরা দ্রুত শেখে, তারা একসময় ক্লাসে একঘেয়েমি অনুভব করে। বেশি জটিল প্রশ্ন করে শিক্ষককে অস্থির করে তোলে। অন্যদিকে, স্বল্পবুদ্ধির শিক্ষার্থীরা ধীরে শেখে। তারা ক্লাসের অন্যদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। ফলে

তারাও একসময় পড়া থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধির শিক্ষার্থীকে ক্লাসে সম্পৃক্ত করাই একজন শিক্ষকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

কটূকথা বলে কাউকে নিবৃত্ত করা কোনো সমাধান নয়। বরং প্রত্যেক শ্রেণির চাহিদাকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করে নিলে সহজেই এই সমস্যার সমাধান করা যায়। যেমন পাঠদানের সময় অগ্রসর শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে বোঝানোর কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। যে ক্ষীণবুদ্ধির শিক্ষার্থী তার বুঝতে পারার অক্ষমতা নিয়ে কিছুটা মুখচোরা হয়ে থাকে, শিক্ষককে প্রশ্ন করতে ভয় পায়, সে অনায়াসে তার সতীর্থ থেকে পড়া বুঝে নিতে পারে। এছাড়া একটা কিছু পড়ানোর পর দলীয় কাজ দেওয়া উচিত। এই দল বিন্যাসের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সব মেধার শিক্ষার্থী যেন দলে থাকে। দলীয় আলোচনার সময় অবশ্যই উন্নত চিন্তনমূলক প্রশ্ন দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি যেমন স্বচ্ছ হবে, তেমনি চিন্তন প্রক্রিয়ায় প্রবেশে উদ্বুদ্ধ হবে। এতে করে নিম্নবুদ্ধির শিক্ষার্থীরাও চিন্তনে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে।

তবে এখন আর IQ বা বুদ্ধিমত্তাকে একজন মানুষের বুদ্ধি পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। আবেগীয় ও সামাজিক বুদ্ধিমত্তাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

EQ বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ধারণাটি জনপ্রিয় করেন ডেনিয়াল গোলম্যান (Daniel Goleman)। তিনি ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Emotional Intelligence-এর মাধ্যমে দেখান যে জীবনে সাফল্যের জন্য শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়; বরং নিজের ও অন্যের আবেগ বোঝা এবং নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেন Peter Salovey এবং John D. Mayer।

EQ বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহানুভূতি, ধৈর্য ও মানসিক স্থিতিশীলতা তৈরি করে। একজন উচ্চ EQ সম্পন্ন ব্যক্তি সহজেই অন্যের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে। সেই অনুযায়ী আচরণ করে। কর্মক্ষেত্রে দল পরিচালনা, সম্পর্ক রক্ষা এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে EQ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নেতা যদি তার দলের সদস্যদের অনুভূতি বুঝতে পারেন, তিনি সহজেই তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন।

SQ বা সামাজিক বুদ্ধিমত্তা ধারণাটি প্রথম উপস্থাপন করেন এডওয়ার্ড থর্নডাইক (Edward Thorndike)। ১৯২০ সালে তিনি 'Social Intelligence' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তিনি একজন ব্যক্তির অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সামাজিক পরিস্থিতি বোঝা এবং কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। বর্তমান যুগে এই ধারণা আরও বিস্তৃত হয়েছে। একে ব্যক্তিগত ও পেশাগত সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্য IQ, EQ এবং SQ—এই তিনটি বুদ্ধিমত্তার সমন্বিত বিকাশ অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের তাই কেবল বইয়ের মধ্যে আটকে না রেখে তাদের আবেগীয় ও সামাজিক দক্ষতার বিকাশে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এতে তারা একেকজন ভারসাম্যপূর্ণ ও সফল মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।

হরেক রকম বুদ্ধি

আপনার ক্লাসেই দেখবেন কিছু শিক্ষার্থী আছে আপন মনে গান গায়। কেউ বা ইউটিউব দেখে নাচে। কেউ আবার চুপটি করে বসে ছবি আঁকে। এদের অনেকে আবার প্রচলিত ধারণায় পড়াশোনায় ভালো না। এ নিয়ে মা বাবা, এমনকি শিক্ষকদের আফসোসের অন্ত থাকে না। তারা বলেন, ইশ মেয়েটা কত সুন্দর গান গায়, কিন্তু পড়াশোনায় তো ভালো না। এর ভবিষ্যৎ কী হবে?

আমাদের সমাজে পড়াশোনা মানেই গাদা গাদা তথ্য মাথায় ধরে রাখতে পারা। যার মাথায় যত বেশি তথ্য ধরে, সে তত মেধাবী। সে তত বুদ্ধিমান। অথচ মান্না দে বা রুনা লায়লার মতো সংগীতশিল্পীকে আমরা মাথায় তুলে রাখি। শচীন টেন্ডলকারের মতো খেলোয়াড় আমাদের স্বপ্নপুরুষ। এরা তো মাথায় তথ্যের ঝাঁকা নিয়ে ঘুরে না। তারা কি মেধাবী নয়? তারা কি বুদ্ধিমান নন?

এই জটিলতার মীমাংসা করেছেন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী হাওয়ার্ড গার্ডনার (Howard Gardner) ১৯৮৩ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'Frames of Mind'-এ। সেখানে তিনি 'Multiple Intelligences' বা 'বহুবুদ্ধির ধারণা' উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, বুদ্ধিমত্তা কোনো একক গাণিতিক বা ভাষাগত দক্ষতার ওপর নির্ভর করে না; বরং মানুষের বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধি থাকে, যা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

গার্ডনারের মতে, প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন বুদ্ধিতে ভিন্ন মাত্রার দক্ষতা রাখে এবং শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা করা উচিত।

বহুবিধ বুদ্ধিতত্ত্ব (Multiple Intelligence Theory) অনুযায়ী, স্কুলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সনাক্ত করার জন্য বুদ্ধির সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। হাওয়ার্ড গার্ডনার (Howard Gardner, 1983) অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধিকে বোঝার রীতি বর্জন করে অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুদ্ধির স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি বুদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন লেখালেখি, স্নায়ু বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদি, মেধাবী ও স্বল্পবুদ্ধিমান ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণীর ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধির ধারণা গঠন করেন। তিনি অপেক্ষাকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণ আট প্রকার বুদ্ধির কথা বলেছেন। যেমন—

১) ভাষাগত বুদ্ধি : এটি হলো ভাষাগত ক্ষমতা যার দ্বারা ব্যক্তি নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। সাধারণভাবে লেখক, শিক্ষক, বক্তা প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে এই ধরনের বুদ্ধি বেশি দেখা যায়।

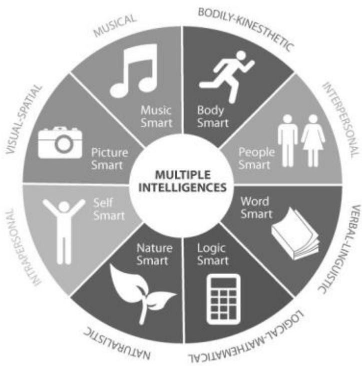

২) স্থানিক বুদ্ধি : এই ধরনের বুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তির স্থান সংক্রান্ত ধারণাকে মানসিক দিক দিয়ে প্রকাশ করতে পারে এবং ত্রিমাত্রিকভাবে চিন্তা করতে পারে। স্থপতি চিত্রশিল্পী, নাবিক প্রভৃতি কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই ধরনের বুদ্ধি বেশি থাকে।

৩) যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধি : এই ধরনের ক্ষমতার মাধ্যমে ব্যক্তি যৌক্তিক ও গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে সামর্থ্য হয়। বিজ্ঞানী, শিক্ষক, দার্শনিক, গণিতবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে এই বুদ্ধি দেখা যায়।

৪) সংগীত সংক্রান্ত বুদ্ধি : ব্যক্তির স্বরগ্রাম পৃথকীকরণের ক্ষমতা, সুরবোধ, তাল, লয় প্রভৃতির ক্ষমতাকে সংগীত সংক্রান্ত বুদ্ধি বলে। সাধারণত সুরকার, গীতিকার, সংগীতশিল্পী প্রভৃতি ব্যক্তিদের এই বুদ্ধি বেশি থাকে।

৫) শারীরবৃত্তিক গতীয় বুদ্ধি : কোনো কিছু তৈরি করতে বা সমস্যা সমাধান করতে ব্যক্তির শরীরের পুরো অংশ বা কিছু অংশকে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে শারীরবৃত্তিক গতীয় বুদ্ধি বলে। খেলোয়াড়, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে এই বুদ্ধি বেশি দেখা যায়।

৬) অন্তঃব্যক্তি/ব্যক্তিমধ্যস্থ বুদ্ধি : এই ধরনের বুদ্ধির সাহায্যে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়। ব্যক্তির নিজের আত্মসচেতনতা গঠনে এই বুদ্ধি বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৭) আন্তঃব্যক্তি বুদ্ধি : এই বুদ্ধির সাহায্যে ব্যক্তি অন্যকে বুঝতে পারে এবং অন্যদের সঙ্গে সঠিক মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। কাউন্সিলর, শিক্ষক- শিক্ষিকা প্রমুখ ব্যক্তিদের এই বুদ্ধি বেশি দেখা যায়।

৮) প্রকৃতিগত বুদ্ধি : এই বুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি প্রাকৃতিক বা সজীব উপাদানকে পৃথকীকরণ বা চিহ্নিত করতে পারে। তা ছাড়াও এই বুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলি অনুধাবন করতে পারে। কৃষক, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্যে এই বুদ্ধি বেশি দেখা যায়।

শিক্ষার্থীর বুদ্ধির বৈচিত্র্যকে সামনে রেখে গুগল দারুণ একটি লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। 'লার্ন ইওর ওয়ে' নামের ওয়েব সাইটে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, সক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী পাঠ্য বিষয়কে নিজের মতো করে (টেক্সট, অডিও, ভিডিও, কুইজ ইত্যাদি) তৈরি করে নেওয়া যায়।

আবেগ যখন বুদ্ধির অংশ

> Emotional intelligence is not about being emotional; it's about being smart with emotions.
>
> —George Stern

ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (Emotional Intelligence) অর্থাৎ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের নিজের আবেগ চিনতে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অন্যের আবেগ বুঝে সহানুভূতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারার সক্ষমতা। চাপপূর্ণ বা সংকটময় মুহূর্তে আবেগগতভাবে বুদ্ধিমান মানুষরা ধৈর্য, সচেতনতা ও সংবেদনশীলতার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেন।

প্রখ্যাত আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী এবং লেখক ড্যানিয়েল গোলম্যান ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স (EI) বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* বইয়ে তিনি আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার একটি নতুন ধারণা তুলে ধরেন। সেখানে শারীরিক ও মানসিক দক্ষতার পাশাপাশি মানুষের অনুভূতি ও আবেগের প্রভাবকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

গোলম্যানের মতে, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যক্তির সফলতা এবং সম্পর্কের মান উন্নয়নে আইকিউ (IQ)-এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

ড্যানিয়েল গোলম্যান তার তত্ত্বে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে পাঁচটি প্রধান উপাদানে ভাগ করেছেন :

১. আবেগের আত্মবিশ্লেষণ (Self-awareness)

এটি নিজের আবেগ এবং অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সেগুলোর প্রতি সচেতন থাকা। অর্থাৎ, আপনি কীভাবে অনুভব করছেন তা বুঝতে পারা এবং এই অনুভূতির প্রভাব আপনার আচরণে কীভাবে পড়ছে তা জানার সক্ষমতা।

উদাহরণ : আপনি যদি চিন্তিত বা উত্তেজিত অনুভব করেন, তবে সেই অনুভূতির কারণ চিহ্নিত করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

২. আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Self-regulation)

এটি হলো নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা, যাতে কোনো আবেগের প্রভাবে আপনি অযথা প্রতিক্রিয়া না জানিয়ে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

উদাহরণ : যখন আপনি ক্ষিপ্ত হন, তখন দ্রুত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পরিস্থিতি বুঝে শান্তভাবে প্রতিক্রিয়া জানান।

৩. অনুপ্রেরণা (Motivation)

ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা ব্যক্তিকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে তোলে। যাদের উচ্চ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স থাকে, তারা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য নিয়মিত পরিশ্রম ও সংকল্প করে।

উদাহরণ : আপনি যখন দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন, আপনি নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং ব্যর্থতার পরেও উঠে দাঁড়িয়ে আবার চেষ্টা করেন।

৪. সহানুভূতি (Empathy)

এটি অন্যদের অনুভূতি বোঝা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সের এই উপাদানটি সম্পর্কের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

উদাহরণ : আপনি যদি কাউকে মর্মাহত অবস্থায় দেখেন, তবে আপনি তার অনুভূতির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে সমর্থন ও সাহায্য করতে পারেন।

৫. সামাজিক দক্ষতা (Social Skills)

এটি অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সফলভাবে যোগাযোগ স্থাপন করার ক্ষমতা। এটি একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, সংহতি ও সহায়তা তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ : আপনি যদি একটি দলের অংশ হন, তবে দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হবেন।

গোলম্যানের মতে, ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমাদের কর্মক্ষেত্রে সফলতা, সম্পর্কের মান, নেতৃত্বের দক্ষতা, এবং মনের শান্তি বজায় রাখায় সহায়তা করে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি যদি তার আবেগের প্রতি সচেতন থাকে এবং সেগুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে আরও সফল, সুখী এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারে।

ড্যানিয়েল গোলম্যানের ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারি, শুধু বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ নয়, বরং আবেগের যথাযথ পরিচালনা এবং অন্যদের অনুভূতির প্রতি সহানুভূতির মাধ্যমে আমরা জীবনে আরও সফল এবং সামাজিক হতে পারি। তার তত্ত্বটি আজকের যুগে সফলতা এবং সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আবেগীয় দক্ষতার **১২**টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ নিচে তুলে ধরা হলো—

১. প্রতিক্রিয়ার আগে বিরত থাকা

মুহূর্তের উত্তেজনায় না ভেবে বলা বা লেখা অনেক সময় সম্পর্কের ক্ষতি করে। উচ্চ আবেগীয় ব্যক্তি নিজেকে সময় দেন, ভাবেন, তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

উদাহরণ : রাগের মুহূর্তে মেসেজ লিখে সেটা পাঠানোর আগে ১০ মিনিট অপেক্ষা করে মুছে ফেলা।

২. নিজেই সঠিক এমন না ভাবা

নিজের ভুল স্বীকার করতে ভয় না পাওয়াই পরিপক্বতার লক্ষণ। বিতর্ক চলাকালে মত বদলে নেওয়া আত্মমর্যাদা হানি নয়, বরং বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

৩. চাপের মধ্যে স্থির থাকা

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিকল্পনা তৈরি করা আবেগীয় দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ দিক।

উদাহরণ : হঠাৎ ডেডলাইন পেয়ে আতঙ্ক না ছড়িয়ে ধাপে ধাপে কাজ ভাগ করে ফেলা।

৪. অন্যের কথা শোনা

মানুষ চায় তার কথা কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনুক। প্রশ্ন করে, চোখে চোখ রেখে কথা বললে সহানুভূতির প্রকাশ বোঝা যায়।

৫. আবেগের পরিবর্তন বোঝা

সহকর্মী বা বন্ধুর মুখভঙ্গি, স্বরের পরিবর্তন থেকে তার মানসিক অবস্থা বোঝা এবং খোঁজ নেওয়া উচ্চ আবেগীয় দক্ষতার পরিচয়।

৬. নিজের ভুলের দায় স্বীকার করা

দোষ চাপানোর চেষ্টা না করে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করে বলা, "আমি দায়ী, সামনে থেকে ঠিক করব"—এই মনোভাব শ্রদ্ধা অর্জন করে।

৭. সমালোচনা গ্রহণের ক্ষমতা

ফিডব্যাক শুনে প্রতিরোধমূলক না হয়ে ধন্যবাদ জানানো—এটা শেখার মানসিকতা প্রকাশ করে।

৮. অজুহাত ছাড়া ক্ষমা চাওয়া

"আমি ব্যস্ত ছিলাম" নয়, বরং "আমি তোমার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারিনি, দুঃখিত"—এই সরল স্বীকারোক্তি সম্পর্ক দৃঢ় করে।

৯. অন্যের সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ

নিজের স্বার্থের বাইরে গিয়েও অন্যকে সাধুবাদ জানানো, এমনকি নিজে পিছনে পড়ে গেলেও।

১০. কঠিন সময়ে সদয় থাকা

রূঢ় কথার জবাবে ভদ্রতা বজায় রাখা পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়া। উচ্চ আবেগীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি তর্ক নয়, শান্তি খোঁজেন।

১১. শ্রদ্ধাশীলভাবে সীমা নির্ধারণ

'না' বলাটাও একটি দক্ষতা, তবে তা যেন সৌজন্যের সঙ্গে হয়। সময়, শক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সীমারেখা দরকার।

১২. সহানুভূতির মাধ্যমে সাহায্য

সব সমস্যা সমাধান হয়তো করা যাবে না, তবে পাশে থেকে শোনা-বোঝা অনেক সময় ভালো কাজ দেয়।

উচ্চ আবেগীয় দক্ষতা কোনো জন্মগত গুণ নয়; এটি চর্চার মাধ্যমে অর্জনযোগ্য। আত্মপর্যালোচনা, মনোযোগ দিয়ে শোনা, আবেগ নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন, এবং সহানুভূতির মনোভাব—এসব চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে একজন মানুষ হয়ে উঠতে পারে উচ্চ আবেগীয় বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।

শিশুর আবেগীয় সংযোগ

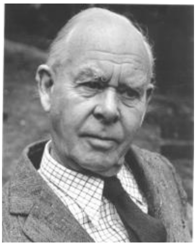

শৈশবে একটি শিশুর মননে ভবিষ্যৎ আচরণের বীজ বোপিত হয়। তখন সে তার চারপাশ থেকে যেসব আচরণ পায়, তার প্রতিফলন ঘটায় পরবর্তী জীবনে। ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী জন বাওলবি (John Bowlby) তাঁর 'অ্যাটাচমেন্ট থিওরি'র মাধ্যমে শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে মা অথবা প্রধান যত্নদাতার সঙ্গে আবেগীয় সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। তাঁর তত্ত্ব আজও মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসাবিদদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিশু তার যত্নদাতার সঙ্গে এক গভীর আবেগীয় সংযোগ (attachment) তৈরি করে, যা তার ভবিষ্যৎ সামাজিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংযোগ শিশুদের নিরাপত্তা, শখ, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে।

বাওলবি মনে করতেন, শিশুর এবং তার প্রধান যত্নদাতার (সাধারণত মা) মধ্যে গঠিত এই আবেগীয় সংযোগ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুরা তাদের মায়ের কাছ থেকে শুধু শারীরিক নিরাপত্তা নয়, মানসিক ও আবেগীয় নিরাপত্তাও চায়। যখন শিশু তার যত্নদাতার কাছ থেকে এই নিরাপত্তা পায়, তখন তার মনে সমাজের প্রতি বিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়, যা ভবিষ্যতে অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে সহায়তা করে।

বাওলবি ও তাঁর সহকর্মী মেরি এনসওর্থ (Mary Ainsworth) শিশুদের অ্যাটাচমেন্টের প্রকার চারটি ধাপে ভাগ করেছেন :

১. প্রাক-সংযুক্তি পর্ব (Pre-attachment stage)

এটি শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক মাসে ঘটে (০-৩ মাস)। এই সময়ে শিশু যত্নদাতার কাছ থেকে আরাম ও নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য সামাজিক আচরণ শুরু করে, কিন্তু বিশেষ কোনো ব্যক্তি নির্ধারণ করে না। সে সব পরিচিতের প্রতি সমানভাবে সাড়া দেয়।

২. সংযুক্তি সৃজন পর্ব (Attachment-in-the-making stage)

এই পর্বে (৩-৬ মাস) শিশু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের প্রতি বিশেষ আস্থার অনুভূতি